‘জীবনের শাহবাগ, জীবনযুদ্ধের শাহবাগ’ : রাষ্ট্রীয় আত্মিক ব্যাধির সনাক্তকরণ

By Asif Mahmud

২০১৩ সালের শাহবাগ আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনার প্রভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বেশ বড়সড় কিছু পরিবর্তন আসে। ইসলামবিদ্বেষ চরম আকার ধারণ করা, বিরোধীদল দমন, সংবাদপত্রসহ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন, নির্বাচন কারচুপি করে ওয়ান পার্টি স্টেট কায়েম করার মত ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে। কেউ কেউ সেগুলোর পেছনে শাহবাগকেই দায়ী করছেন। ২০১৩ সালের ৯ মার্চ ‘আমার দেশ’ পত্রিকায় হেডলাইন ছিলো– ‘শাহবাগে ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি’। কাল পরিক্রমায় আজ আমরা যে ফ্যাসিবাদ দেখছি, সেটি আমার দেশের করা ভবিষ্যদ্বাণীকে মনে করিয়ে দেয়। শাহবাগ আন্দোলন দেখে এই উপসংহার কি ঠিক ছিলো? শাহবাগ আন্দোলন আসলে কী, এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী ছিলো, এর ফলাফল কী — এসব প্রশ্ন নিয়ে আজও মানুষকে সরব থাকতে দেখা যায়। বহুকাল পরেও শাহবাগের এই প্রাসঙ্গিকতার কারণ কী? সেই কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে পড়লাম শাহবাগ আন্দোলন নিয়ে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, গান ও শাহবাগের বিভিন্ন ডকুমেন্টের সংকলন — ‘জীবনের শাহবাগ জীবনযুদ্ধের শাহবাগ’ বইটি। বইটিতে আছে সৈয়দ শামসুল হক, মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুণসহ নানান শাহবাগী কবিদের কবিতা। আছে কবির সুমনের শাহবাগ নিয়ে গান, সেলিনা হোসেন, মোস্তফা মামুনের গল্প, আছে আবদুল গাফফার চৌধুরী, হাসান আজিজুল হক, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, আনিসুল হক প্রমুখের প্রবন্ধ। বইটিতে আরো আছে গণজাগরণ মঞ্চের সাংগঠনিক ঘোষণা, প্রচারপত্র, ঘটনাপঞ্জী ইত্যাদি।

শাহবাগ আন্দোলন এবং গণজাগরণ মঞ্চ মূলত কী?

২০১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনালে বিচারাধীন যুদ্ধাপরাধ মামলার আসামী জামায়াত নেতা আবদুল কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় আদালত। এই রায় প্রত্যাখ্যান করে ৬ ফেব্রুয়ারি শাহবাগ চত্বরে জড়ো হয় ফেসবুক এবং ব্লগ কেন্দ্রিক কিছু লেখক, তাদের ‘যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসি’ চাওয়ার আহবানে সাড়া দেয় তরুণ প্রজন্মের অনেকে। শাহবাগে গণজমায়েত তৈরি হয়। বামপন্থী ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হলেও ধীরে ধীরে আন্দোলনটি তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। শুরুতে কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। ধীরে ধীরে সকল যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসির দাবি, জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধের দাবি, ইসলামী ব্যাংক বয়কট, আমার দেশ পত্রিকা বন্ধের দাবিসহ ৬ দফা দাবি ইত্যাদি একে একে যুক্ত হতে থাকে আন্দোলনে। দীর্ঘ এক মাস চাঙ্গা, এবং দ্বিতীয় মাস তুলনামূলক মেন্দামারা আন্দোলন চলার পর অনানুষ্ঠিনকভাবেই এই আন্দোলন হারিয়ে যায়। মেন্দামারা বলার ব্যাপারটি আপনাদের বুঝে না আসলে আন্দোলনের মাত্র তিনমাস পর প্রকাশিত হওয়া বইটির ভূমিকা পড়া দ্রষ্টব্য। সেখানে সংকলক আবেদ খান এবং শুভ রহমান আফসোস করে বলেছেন, “আজকাল অনেকে

এমন কথা বলছেন যে, শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চ দারুণভাবে ফ্লপ করেছে।” সংকলক পুরো ভূমিকায় শাহবাগ আন্দোলনকে রক্ষা করা এবং উজ্জ্বল করা কেন জরুরী সেটি ব্যাখ্যা করেছেন। এবং শেষে রেগেমেগে এও বলেছেন যে, যারা জ্ঞাতসারে শাহবাগের সমালোচনা করছেন, “তাঁদেরকে সরাসরি প্রগতিশীলতার প্রতিপক্ষ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধের বিরোধী পক্ষ হিসেবে গণ্য করতে হবে।” [১] সে যাহোক, স্বল্পস্থায়ী এই আন্দোলন নিয়ে তবু কেন এত কথা হয়? কেন এই আন্দোলন প্রাসঙ্গিক হয়ে আছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে? কেন এবং কীভাবে ‘শাহবাগী’ শব্দটি পরিণত হয়েছে গালিতে। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তালাশ করা জরুরি।

শাহবাগের উত্থান কবে?

শাহবাগের উত্থান কি ২০১৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি? নাকি আরো বহু আগে? শাহবাগের স্পিরিট কি কেবলই গণজাগরণ মঞ্চকে ঘিরে? নাকি এই আন্দোলন বহু পুরনো! এই বিষয়ে যতীন সরকার তার প্রবন্ধে বেশ স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন। তিনি মোটেই শাহবাগকে ‘দৈবাৎ’ হিসেবে দেখতে আগ্রহী হন নি। তিনি বলছেন, “আকস্মিক প্রকাশ ঘটলেও এর জন্ম মোটেই অকস্মাত বা দৈবাৎ ঘটে যায়নি, ইতিহাসের বস্তুগত নিয়মেই দীর্ঘদিন ধরে আমাদের অজান্তে প্রতিটি দিন তিল তিল করে এ দিবসটিকে সৃষ্টি করে চলেছিলো।” [৩] তিনি শাহবাগকে দেখছেন ‘ঐতিহাসিক বস্তুবাদসম্মত শ্রেণীসংগ্রাম’ হিসেবে। বইটিতে বারবার জাহানারা ইমামকে স্মরণ করা হয়েছে, যিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ‘ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি (ঘাদানিক)’ গঠন করেছিলেন ১৯৯২ সালে। সেই ঘাদানিকের উদ্যোগে গণআদালত গঠিত হয় এবং সেই আদালত অধ্যাপক গোলাম আযমকে ফাঁসির রায় প্রদান করে। কিন্তু, কেউ কেউ শাহবাগকে পড়তে চান আরো পেছন থেকে। ভারত ভাগের পর থেকে বামপন্থী ও ভারতপন্থী কিছু লোকের সাংস্কৃতিক ‘বিপ্লব’ অব্যাহত ছিলো। চলনেবলনে কোলকাতার ছাপ, ভাষা, সংস্কৃতিতে ‘বাঙালিয়ানা’র নাম করে কোলকাতাকে আমদানি করা এসব কাজেই শুরু থেকে দেখা যেত একটি গোষ্ঠীকে। কেউ কেউ শাহবাগকে সেই গোষ্ঠীরই নাতিপুতিদের জড়ো হওয়ার ঘটনা বলেছেন। যাকগে, কোত্থেকে এলো সে নাহয় ইতিহাসবিদরাই আলাপ করবেন, আমরা বরং কী করতে এলো তাতেই মনোযোগী হই।

শাহবাগ মূলত কোন দাবিতে আন্দোলন করছে?

শাহবাগে অবস্থান নেয়ার পর থেকেই গণজাগরণ মঞ্চের দাবি-দাওয়া নিয়ে ছিলো ধোয়াশা। ৬ ফেব্রুয়ারি শাহবাগে অবস্থান নেয়া হয় ‘কাদের মোল্লার ফাঁসি’র দাবি নিয়ে। একইসাথে সেদিনই দাবি তোলা হয় ‘সকল যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসি’র। মাত্র একদিনের মাথায় দাবি বর্ধিত হয়ে ‘জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা’র দাবিও যুক্ত হয়। ৮ তারিখে যুক্ত হয় জামায়াতের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বয়কটের দাবি। ২১ ফেব্রুয়ারি আসে ৬ দফা দাবি। এই ৬ দফায় জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে পুলিশের ‘কঠোর’ হস্তক্ষেপ করার দাবিও ছিলো। তবে স্পষ্টভাবে শাহবাগের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উঠে আসে গণজাগরণ মঞ্চের ঘোষণা ও শপথে। এটি পাঠ করেন গণজাগরণমঞ্চের মুখোপাত্র ডা ইমরান এইচ সরকার। শাহবাগকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে তিনি বলেন, “এটা বাঙালি জাতিকে

কলঙ্কমুক্ত করার আরেক মুক্তিযুদ্ধ। ন্যায়বিচার, আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশকে রাজাকারমুক্ত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলাই…লক্ষ্য।” [৪] এবং, “সামন্তবাদী ও ধর্মীয় গোঁড়ামিযুক্ত অপসংস্কৃতি বিরোধী” [৯] বাংলাদেশের কথা বলা হয় ‘রনাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা’ সংগঠনের পক্ষ থেকে। তাদের এই লক্ষ্য অর্জনে উল্লেখযোগ্য দাবি-দাওয়ার মধ্যে ছিলো– [৫]

১। যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এবং সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রপক্ষের আপিলের অধিকার নিয়ে আসা ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমা করার অধিকার বাতিল করা।

২। জামায়াত-শিবিরসহ সকল ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের রাজনীতি নিষিদ্ধ [৮] ও তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা।

৩। ইসলামী ব্যাংক, ইবনে সীনা, ফোকাস-রেটিনা কোচিং বয়কট করা এবং নিষিদ্ধের দাবি।

৪। জামায়াত-শিবির চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির দাবি।

৫। দিগন্ত টিভি, নয়াদিগন্ত, আমার দেশ, সংগ্রাম পত্রিকা এবং সোনার বাংলা ব্লগ বয়কট এবং নিষিদ্ধ [৬] দাবি।

৬। জামায়াতের পক্ষ নেয়ায় বিএনপিরও শাস্তির দাবি [৭]।

শুধু তাই না, কবিতা এবং গল্পেও বারবার উঠে এসেছে শাহবাগের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। সৈয়দ শামসুল হক কবিতায় বলছেন “ধর্মনিরপেক্ষ দেশ” শাহবাগের দাবি [১০], মাহমুদ উল্লাহ ‘রাজাকারের বিচার’ কবিতায় লিখেছেন, “কাটলো ওরা জাতীয়তা, সেকুলারের নীতি আবার দেশে ছড়িয়ে পড়ে মধ্যযুগের ভীতি”, আরো লিখেন, “ইদুরগুলো বোশেখ জষ্টি কেটে ফেলতে চায়” এবং “পহেলা বোশেখ পাষণ্ডরা রক্তে ভাসায় রমনা” [১১], যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সঙ্গে সেকুলার নীতি কাটার সম্পর্ক কিংবা মধ্যযুগের সম্পর্ক কী সেটা প্রশ্ন আসে। আবার পহেলা বৈশাখ নিয়ে মুসলিমদের আপত্তির ব্যাপারটি এখানে উঠে আসায় সন্দেহ জাগে, টার্গেট কি যুদ্ধাপরাধীরা নাকি সাধারণ মুসলিমও এর আওতায় পড়তে পারে।

সে যা হোক, লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, প্রায় প্রতিটি বক্তব্যে এবং গল্প কবিতায় “ধর্মনিরপেক্ষ” বাংলাদেশ, “সেকুলার” বাংলাদেশের ব্যাপারটি উঠে এসেছে এবং এটি গণজাগরণ মঞ্চের একটি অন্যতম প্রধান দাবি হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। একই সাথে সেকুলার ও প্রগতিশীল বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ হিসেবে জামায়াত-শিবির, হেফাজতে ইসলামীসহ অন্যান্য ধর্মীয় রাজনৈতিক ও ‘মৌলবাদী’ দলকে নিষিদ্ধ করা, নাগরিকত্ব বাতিল করা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিষিদ্ধ করা, তাদেরকে প্রতিহত করা ও পুলিশের হাতে সোপর্দ করার দাবিও উঠে এসেছে। এখানে লেবেলিং লক্ষ্যণীয়। প্রায়শয়ই এসব দলের ক্ষেত্রে ‘মৌলবাদী’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে

শাহবাগে আন্দোলনকারীদের বলা হচ্ছে প্রগতিশীল। শুরুতে কেবল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলনটির ‘মৌলবাদী বনাম প্রগতিশীল’ ন্যারেটিভ মোটামুটি একটা ধারণা দেয় আন্দোলনটি সম্পর্কে। তবে, আবদুল গাফফার চৌধুরী (‘আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’ গানের লেখক) তার প্রবন্ধে ‘৫২ এর ভাষা আন্দোলন আর শাহবাগ আন্দোলনকে তুলনা করে বেশ পরিষ্কার ভাবেই বলেন, “…গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র রক্ষার আন্দোলন” [১২]। তিনি আরো বলেন, “গণতান্ত্রিক ও সেকুলার বিপ্লব শুধু পরাজিত নয় বিলুপ্ত হওয়ার পথে।” [১৩] শাহবাগ “মধ্যযুগের উটের পিঠে সওয়ার হয়ে পশ্চাতগমন…” [১৪] করা দেশকে উঠিয়ে এনেছে। ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, “…তারা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ চায়, ছেলে-মেয়ের সমান অধিকার চায়…” [১৫] দিল মনোয়ারা মনু লিখেছেন, “...নারী পুরুষের সমতাভিত্তিক, পারস্পরিক সম্মান ও সমঝোতাপূর্ণ এক প্রগতিশীল মানবিক সমাজ…” চায়, আরো লিখেছেন, “...নারীরাও পুরুষের সমান মর্যাদার অধিকারি না হলে, ধর্মনিরপেক্ষ বা সেক্যুলার বাংলাদেশ কখনই গড়ে উঠবেনা।” [১৬]

এতে মোটামুটি শাহবাগের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। সামারাইজ করতে হলে বলতে হবে, “সেকুলার বাংলাদেশ, মৌলবাদ মুক্ত প্রগতিশীল বাংলাদেশ” শাহবাগ আন্দোলনের ‘অন্যতম’ লক্ষ্য। প্রধান লক্ষ্য যুদ্ধাপরাধীর বিচার। যদিও শাহবাগ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা নাস্তিক ব্লগার আসিফ মহিউদ্দিনের বক্তব্য শুনলে একটু খটকাই লাগে। ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ সালে ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে আসিফের এই বক্তব্যটি প্রকাশিত হয়,

“We have been waging war on religious fundamentalists on the blogs for years. Shahbag has been successful because people are outraged by the war crimes”.

“আমরা ধার্মিক মৌলবাদিদের সাথে অনেক দিন থেকেই ব্লগে যুদ্ধ করে আসছিলাম। শাহবাগ সফল হয়েছে কারণ মানুষ যুদ্ধাপরাধের নির্মমতার ব্যাপারে আবেগাক্রান্ত”। [১৭]

আসিফ মহিউদ্দিনের বক্তব্য অনুসারে এমনটা মনে হয় যে, শাহবাগে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে কেবলই একটা সাইনবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, মূলত এটি ছিলো সেকুলার বাংলাদেশ তৈরির আন্দোলন এবং ধর্মীয় দলগুলোকে প্রতিহত করার আন্দোলন।

শাহবাগ আন্দোলনের শত্রু মূলত কারা?

কোনো একটি গোষ্ঠীর বা রাজনৈতিক শক্তির উত্থান হলে, যে ব্যাপারটি অনিবার্যরূপে চলে আসে তা হলো শত্রু-মিত্রের ধারণা। সেই গোষ্ঠীটির পক্ষে কারা আছে, আর বিপক্ষে কারা? আবার সেই গোষ্ঠীটি কার পক্ষ নিচ্ছে আর কার সাথে পোষণ করছে শত্রুতা?

প্রথম দিনের আন্দোলনের মূল কথা ছিলো—কাদের মোল্লাসহ সকল যুদ্ধাপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তি অর্থাৎ, মৃত্যুদণ্ড। তার মানে প্রথম দিনের বক্তব্য অনুযায়ী মূল শত্রু যুদ্ধাপরাধীরা। কিন্তু, এর পরদিনই জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি আসে। মানে শত্রু যুদ্ধাপরাধী এবং জামায়াত-শিবির। কিন্তু একদিন পরেই গণজাগরণ মঞ্চের ঘোষণা ও শপথে ডা. ইমরান এইচ সরকার বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

“...যারা যুদ্ধাপরাধী জামায়াতে ইসলামীকে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করেছে এবং এখনো নানা কৌশলে তাদেরকে সহযোগিতা করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল, নৈরাজ্য সৃষ্টি এবং দেশকে পুনরায় ৭৫ পরবর্তী ধারায় নেয়ার চেষ্টা করছে, সেই সব অপশক্তির বিরুদ্ধেও গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানাচ্ছে।” [১৮]

জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকারকে দেয়া স্মারকলিপিতে যেসব দাবি উত্থাপন করা হয়, তার ৪ নম্বর দাবিতেও নামোল্লেখ না করে বিএনপিকে বিচারের আওতায় আনার দাবি করা হয়। [১৯]

“আমরা তোমাদের মাঝে বাঁচতে চাই”–লেখায় কোনো রাখঢাক না রেখে একেবারে সরাসরিই বলা হয়, “...বিএনপিও জাতির কাছে সমানভাবে দোষী এবং প্রত্যাখ্যানযোগ্য অপরাধী রাজনৈতিক দল হিসেবে চিহ্নিত হলো।” [২০]

তাহলে, এবার শাহবাগে আন্দোলনকারীদের শত্রু দাঁড়ালো – যুদ্ধাপরাধীরা, জামায়াত-শিবির এবং বিএনপি।

কিন্তু, ইতোমধ্যেই হেফাজতে ইসলামের উত্থান হয়। গণজাগরণ মঞ্চের কতিপয় ব্লগার কতৃক বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সা. কে অবমাননার প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। এবার হেফাজতে ইসলামও শাহবাগীদের শত্রুতে পরিণত হয়। গণজাগরণ মঞ্চের মুখোপাত্র ডা. ইমরান এইচ সরকার হেফাজতে ইসলামকে “নামসর্বস্ব যুদ্ধাপরাধীদের দোসর দল” হিসেবে অভিহিত করেন [২১] এবং গণজাগরণ মঞ্চ ৮ এপ্রিল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার আহবান জানায় [২২]।

এই পর্যায়ে তাদের শত্রু দাঁড়ায় – যুদ্ধাপরাধী, জামায়াত-শিবির, বিএনপি এবং হেফাজত।

কিন্তু, রাষ্ট্রপতিকে দেয়া স্মারকলিপিতে সব ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার দাবি জানানো হয় [৮]। এবং, বইয়ের ভূমিকায় একটি লাইন আছে যা শাহবাগীদের অবস্থানকে আরো পরিষ্কার করে।

“...মৌলবাদ চাঙ্গা হয়েছে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি তাদের নিজস্ব আদর্শগত বা নেতৃত্বগত বিরোধকে এক পাশে সরিয়ে রেখে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির বিপক্ষে একত্রিত হয়েছে…”

অর্থাৎ, বিশেষভাবে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো এবং মোটের উপর আওয়ামীলীগ ব্যতিত বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি যারা আছে, তাদের সবাইকেই শাহবাগ শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করছে।

কিন্তু ব্যাপারটা কি তাই? দেখা গেছে, আওয়ামিলীগকেও শাহবাগ সময়ে সময়ে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে, জামায়াত-বিএনপির সঙ্গে আঁতাতের সন্দেহ করেছে। মুহাম্মদ জাফর ইকবাল তার প্রবন্ধে লিখেন,

“...হঠাৎ একদিন দেখা গেল মতিঝিলে তাদের (জামায়াত-শিবির) সঙ্গে পুলিশের এক ধরণের ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। জামায়াত-শিবির রীতিমত ফুল দিয়ে পুলিশকে বরণ করে নিচ্ছে। দেশের মানুষ তখনই ভুরু কুঁচকে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করতে শুরু করে।” [২৩]

এই পর্যায়ে সরকারের সাথে শাহবাগীদের সম্পর্কে কিছু টানাপোড়েন দেখা যায়। আসলে শাহাবাগ আন্দোলনের হর্তাকর্তারা নিজেদেরকে তাদের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী সরকারের চাইতেও ক্ষমতাবান ভাবতে শুরু করে। ৬ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া শাহবাগ আন্দোলন দুই মাসের মধ্যেই সরকার শাহাবাগের উপর লাগাম আরো শক্ত করে। ১৬ মার্চ আওয়ামী লীগের চাপে চারুকলার সামনে থেকে গণজাগরণ সংস্কৃতি মঞ্চ সরিয়ে নিতে বাধ্য হয় তারা [২৪]। ২ এপ্রিল গণজাগরণ মঞ্চের সাথে সম্পৃক্ত ৩ জন ব্লগারকে গ্রেফতার করা হয়। এইদিন ইমরান এইচ সরকার সরকারের সমালোচনা করে বলেন,

“...কারো নির্দেশে মঞ্চ আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াবে না।” [২৫]

কিন্তু ইতোমধ্যেই আন্দোলনের অস্তিত্ব আর ছিলো না। ১৪ এপ্রিল শেষ এক সমাবেশে ৪ মে এক কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হয় যা গণজাগরণ মঞ্চের আনুষ্ঠানিক ইতির ইঙ্গিত বহন করে।

ভালোমত দৃষ্টি দিলে গণজাগরণ মঞ্চের শত্রুর লম্বা একটা লিস্ট পাওয়া যায়। জামায়াত-শিবির, বিএনপি, হেফাজত, অন্যান্য ধর্মীয় রাজনৈতিক দল, খুবই অল্প হলেও আওয়ামী লীগের কিছু ধার্মিক সমর্থক।

কিন্তু, বন্ধুর লিস্ট করলে সেটা বেশ ছোট। বইটিতে যেসব সংগঠনের বিবৃতি সংযুক্ত করা হয়েছে সেগুলো হলো: সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, মানবাধিকার আইন সালিশ ও পরিবেশ রক্ষা ফাউন্ডেশন, আমরা একাত্তরের রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবাদী নারী গণ সমাবেশ।

বইটিতে উল্লেখযোগ্য যাদের লেখা আছে তারা হলেন: সৈয়দ শামসুল হক, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, কবীর সুমন, সেলিনা হোসেন, মোস্তফা মামুন, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আহমদ রফিক, হাসান আজিজুল হক, আবেদ খান, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, আনিসুল হক, রফিক আজাদ প্রমুখ।

শাহবাগ ও ফ্যাসিজম

শাহবাগের উত্থান ঘটেছিলো একটা ফ্যাসিস্ট দাবি নিয়ে। সেই দাবি হলো – যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবি। সুনির্দিস্টভাবে ফাঁসির দাবি। যাবজ্জীবনেও তারা সন্তুষ্ট নন। দেশে আইন আছে, বিচার ব্যবস্থা আছে। সেগুলোকে উপেক্ষা করে যেই বিচার দাবি করা হয় – সেটি তো ফ্যাসিস্ট দাবিই। আইন ও বিচারকে উপেক্ষা করার কথাটি আমার মনগড়া নয়। মুহাম্মদ নূরুল হুদা তার কবিতায় লেখেন,

“জনতার আদালতে ফাঁসি তার রায়

খুনীর ঘোচে না পাপ রাজার ক্ষমায়।” [২৬]

রাজা দিয়ে সিম্বোলাইজ করা হচ্ছে আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে কিংবা রাষ্ট্রপতিকে এবং প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। ফাঁসির রায় ‘জনগণ’ই দিবে এমনটা বলা হচ্ছে। তিনি আরো লিখেন,

“জনতার রায় আছে আছে শাহবাগ

…

রাজা নেই রাণী নেই আছে শাহবাগ” [২৭]

অর্থাৎ, রাষ্ট্রের, আইনের কিংবা বিচারের দরকার নেই। ‘জনতা’ই রায় দিচ্ছে এবং জনতাই বিচার করবে।

আহমাদ মোস্তফা কামাল লিখেছেন, “এ আন্দোলনের সবচেয়ে বড় অর্জন, আদালতের রায় প্রত্যাখ্যান করার সাহস প্রদর্শন…” তরুণ বয়সে তারা “আদালতের রায় শিরোধার্য–এই অপ্তবাক্য…” মেনে নিয়ে ভুল করেছিলেন বলেও লেখেন [২৮]। ভারতীয় নাগরিক হয়েও বাংলাদেশের আদালতের বিচারকে নকল বিচার হিসেবে চিহ্নিত করে কবির সুমন গানে গানে বলেন, “আসল বিচার চাই” [৩৪]। ৮ ফেব্রুয়ারি ডা. ইমরান এইচ সরকার বেশ চড়া গলায়ই বলেন, “এই রায় কি আমরা মানি? মানি না।” [২৯]

যা বলছিলাম, আইন ও বিচারের তোয়াক্কা না করে সকল যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসির দাবিকে মূল দফায় রেখে চলে শাহবাগীদের আন্দোলন। এবং, এই ফাঁসির জন্য তারা আইন সংশোধন করে সরকারের পক্ষ থেকে আপিলের সুযোগ সংযুক্ত করা ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমার বিধান রহিত করার দাবি জানায় [৩০]। শুধু তাই না, ৩ মাসের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে এই সময়সীমাও তারা বেঁধে দেয়। [৩০] এবং এই দাবিগুলো মানার জন্য ক্রমাগত সরকারকে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। দিনের পর দিন শাহবাগে আন্দোলন, শ্লোগান ও কর্মসূচি অব্যাহত থাকে। মাত্র তিনদিনের মাথায়ই তাদের এই দাবি মন্ত্রীসভায় নীতিগত অনুমোদন পায়। ১৭ ফেব্রুয়ারি বিল পাশ হয় জাতীয় সংসদে। এর মধ্য দিয়েই পূর্ণতা পায় শাহবাগীদের প্রথম ফ্যাসিস্ট দাবি।

শাহবাগীদের ফ্যাসিস্ট দাবির এখানেই শেষ না। তারা জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানায়। এই ব্যাপারে সরকারের প্রতিক্রিয়া জানাতে দেরি হলে তারা বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপিও পাঠায় এই ব্যাপারে। একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি কতটা গণতন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ সেটি পাঠকই মূল্যায়ন করবেন। শুধু রাজনীতি নিষিদ্ধ করাই নয়, বলা হয় জামায়াত-শিবিরের এদেশে হরতাল পালনের কোনো নৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার নেই। [৩১] আচ্ছা, রাজনীতি না করুক, কোনোরকম খেয়ে-পরে বাঁচুক, নাকি? একদমই না। দাবি তোলা হয়, জামায়াত-শিবিরের লোকদের নাগরিকত্ব বাতিল করতে হবে। [১৮] আবদুল গাফফার চৌধুরী তার প্রবন্ধে লিখেন,

“...সরকারি-বেসরকারি সব আবেদনপত্রেও একটি ধারা অবশ্যই রাখতে হবে যে আপনি কি কখনও জামায়াতের মতো রাষ্ট্রদ্রোহী দল ও স্বাধীনতার শত্রুদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন? যদি জবাব হ্যাঁ হয় অথবা তদন্তে জানা যায় আপনি যুক্ত ছিলেন, তাহলে চাকরি পাবেন না।” [৩২]

আচ্ছা, চাকরি না পাক। খাবার না পাক। হবে? উঁহু।

“...জামায়াত-শিবির যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ করেছে, ভিডিও-ফুটেজ ও সংবাদপত্রের ছবি দেখে তাদেরকে চিহ্নিত করে অবিলম্বে গ্রেফতার ও কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।” [৩৩]

প্রথম আলোর সম্পাদক আনিসুল হক বিএনপি ও জামায়াতকে উদ্দেশ্য করে লেখেন, “...তাদেরকে আমরা আইনের হাতে তুলে দেবো।” [৩৫] এই কি শেষ? এমনকি জামায়াত-শিবিরের সাথে মার্জিত ও ভদ্র ভাষায়ও কথা বলা যাবে না।

বইটিতে গণজাগরণের যে বৈশিষ্ট্য মানুষের দৃষ্টি কেড়েছে এমন বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে লেখা হয়:

“...জামায়াত-শিবির ব্যতীত অন্যান্য বিরুদ্ধবাদীদের প্রসঙ্গে মার্জিত ও ভদ্র ভাষায় মন্তব্য করা।” [৩৬]

এইযে ক্রমাগত জামায়াত-শিবিরকে না-মানুষকরণ (ডি-হিউম্যানাইজেশন) করা হয়েছে, এটার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সালে পুলিশের গুলিতে জামায়াত-শিবিরের ৫০ জনের মত কর্মী নিহত হয়। [৩৭] এরপর থেকেই জামায়াত নেতাদের রায় ঘোষণা পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় এবং রাজপথের প্রতিটি আন্দোলনেই জামায়াত-শিবিরের বহু কর্মী-সমর্থক পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে। পাইকারি হারে মামলা আর হয়রানি তো আছেই। এরপর শুরু হয়েছে শিবির ‘সন্দেহে’ ধরপাকড় ও নির্যাতন। যার প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে আমরা দেখি আবরার ফাহাদের শাহাদাত।

জামায়াত-শিবিরের পাশাপাশি বিএনপিরও বিচারের দাবি তোলা হয়েছে, বিএনপিকেও অপরাধী দল সাব্যস্ত করা হয়েছে যা আমরা একটু আগেই দেখেছি। একইভাবে হেফাজতে ইসলামেরও বিচার দাবি করা হয়েছে। হেফাজতকেও একই কায়দায় না-মানুষকরণ করা হয়েছে। যার ফলাফল ৫ মে’র কালোরাতে ঘটে যাওয়া গণহত্যা। মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের হিসেব বলে, এই রাতে প্রায় ৬১ জন নিহত হয়েছেন পুলিশের গুলিতে [৩৭]। হেফাজত বলেছে অগণিত। এরপর আমরা বহুবার হেফাজতের আন্দোলনে পুলিশকে গুলি করতে দেখেছি, খুব সহজেই খুন করতে দেখেছি হেফাজত কর্মীদের। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মোদিবিরোধী আন্দোলনের কথা। এই আন্দোলনেও পুলিশের গুলিতে ১৭ জন নিহত হয়। [৩৮]

তবে জামায়াত-শিবির এবং হেফাজতকে যেই কায়দায় না-মানুষকরণ করা হয়েছে, বিএনপিকে সেরকমটা করা হয়নি। আমরা বিএনপির নাগরিকত্ব বাতিল, চাকরি না দেয়া, কিংবা গ্রেফতারের দাবি জানানোর বিষয়টি সেভাবে দেখি না। বরঞ্চ, বিএনপির ব্যাপারে আহবান দেখি, “...অবিলম্বে জামায়াত-শিবিরের সঙ্গ ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধের ধারায় ফিরে আসুন…” [৩৯]। হেফাজতে ইসলামকে যেমন “...জামায়াতি মুদ্রার অন্য পিঠ” বলা হচ্ছে [৪০] এবং কওমী মাদ্রাসাকে বলা হচ্ছে একাত্তরের পরাজিত মৌলবাদি শক্তির শক্তিশালী প্রতিরক্ষাদুর্গ [৪১], সেরকমটা বিএনপিকে বলা হচ্ছে না। অথচ, হেফাজতের সাথে জামায়াতের আদর্শগত বিরোধের বিষয়টি কারোই অজানা নয়। তবে কেন এক করা হচ্ছে? কেন একই মুদ্রার অন্যপিঠ বলা হচ্ছে? এটি এখনও পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা দেখেছি, তা থেকে যদি বলতে হয় তবে শাহবাগের “ধর্মীয় রাজনীতি” বিদ্বেষের কারণে।

কিন্তু, সামনে যেসব আলোচনা আমরা দেখবো, তাতে প্রশ্ন এসে যেতে পারে, ধর্মীয় রাজনীতি বিদ্বেষ নাকি সরাসরি ধর্মবিদ্বেষ?

ফ্যাসিজমে ফিরে আসি। জামায়াত-শিবিরের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেয়া, মানবাধিকার কেড়ে নেয়া সেসব নাহয় আমরা মেনে নিচ্ছি। জামায়াত-শিবির যেহেতু “যুদ্ধাপরাধী”দের দল, সেহেতু তাদের বিরুদ্ধে সাত খুন হালাল ধরে নিলাম। কিন্তু শাহবাগীদের পরবর্তী দাবিগুলো তাদের ফ্যাসিস্ট চেহারাকে আরো স্পষ্ট করে।

তারা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন চ্যানেল বন্ধ করার দাবি জানায়। বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর মধ্য সবচেয়ে জনপ্রিয় ইসলামী ব্যাংক এবং জনপ্রিয় হাসপাতাল ইবনে সিনা প্রথমে বয়কট [১৮] ও পরে নিষিদ্ধ করার দাবি [১৯] জানায়। ফোকাস, রেটিনার মত জনপ্রিয় কোচিং সেন্টার নিষিদ্ধ করার দাবি জানায়। এসব প্রতিষ্ঠান নিষিদ্ধ হলে জনদুর্ভোগ হলে হোক, তা ভেবে কাজ নেই ‘জনবান্ধব’ এই সংগঠনটির।

শুধু আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়, আশ্চর্য হতে হয় প্রগতিশীল, গণতন্ত্রমনা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এই মানুষগুলো এমনকি সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেল নিষিদ্ধ করারও দাবি জানায়। নয়া দিগন্ত, আমার দেশ, সংগ্রাম ইত্যাদি পত্রিকা এবং সোনার বাংলা ব্লগ নিষিদ্ধ করার দাবি জানায়। আরো দাবি জানায় দিগন্ত টেলিভিশন বন্ধ করার। শুধু তাই না, গণতন্ত্রমনা এই সংগঠনটি ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করার আল্টিমেটামও দেয়, গ্রেফতার না করায় ২৫ ফেব্রুয়ারি ক্ষোভ প্রকাশ করে। এই হলো মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ব্যাপারে শাহবাগীদের প্রকৃত রূপ।

‘আমার দেশ’ পত্রিকা নিষিদ্ধ হয়, সম্পাদক মাহমুদুর রহমান গ্রেফতার হন। সংগ্রাম পত্রিকার সম্পাদকের উপর হামলা হয়, ভাংচুর করা হয় অফিস। দিগন্ত টিভির সম্প্রচার নিষিদ্ধ হয়। শাহবাগীদের এই ফ্যাসিস্ট দাবিও পূর্ণতা পায়।

আজকে আমরা দেখছি, দেশে গণতন্ত্র নেই। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নেই। সরকারের বিরুদ্ধে যারাই কথা বলছে, তারাই দমন-পীড়ন, গুম-খুনের স্বীকার হচ্ছে। দেশে আজকে বিচারহীনতা দেখছি। আইনের শাসন খুঁজে বেড়াচ্ছি, পাচ্ছি না। এই সবকিছুই শাহবাগের দাবিতে অন্তর্ভূক্ত ছিলো। শাহবাগ আন্দোলনের অনিবার্য ফলাফল আমরা দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। শাহবাগ ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছে। মাহমুদুর রহমানের ‘আমার দেশ’ পত্রিকার হেডলাইনটি বারবার মনে পড়ে যায়, “শাহবাগে ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি”।

শাহবাগ ও ইসলামবিদ্বেষ

শাহবাগের ইসলামবিদ্বেষী চরিত্র সামনে আসে ব্লগার রাজিব ওরফে থাবা বাবার হত্যাকাণ্ডের পর। ১৫ ফেব্রুয়ারি ব্লগার রাজিবকে হত্যা করে কতিপয় আততায়ী। সাথে সাথেই শাহবাগের মঞ্চ থেকে রাজিবকে ‘দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ’ বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু রাজিবের মৃত্যুর পরপরই তার বেশ কিছু ফিরিস্তি বেরিয়ে আসে। সে ‘থাবা বাবা’ নাম নিয়ে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা. কে নিয়ে ভীষণ অবমাননাকর ও জঘন্য লেখা লিখতো ব্লগে। ‘নুরানীচাপা’ নামে একটি ব্লগসাইটে সে আল্লাহ এবং নবীজী সা. এবং ইসলামকে কটুক্তি করে লেখালিখি করতো। এসব বিষয় সামনে আসার পর বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা শাহবাগীদের ওপর ক্ষেপে যায়। তখন শুধু রাজিবই নয়, অভিজিত রায়, আসিফ মহিউদ্দিন, নীলয় নিলসহ আরো অনেকের নাম সামনে আসে যারা তখন শাহবাগ আন্দোলনের সাথে যুক্ত। এছাড়া ইসলাম অবমাননাকারী কুখ্যাত রাজিবের জন্য শাহবাগে আলো প্রজ্বলন, রাজিবের জানাযার নামাজ আদায় এবং বারংবার রাজিবকে শহীদ সম্বোধন করা – শাহবাগীদের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানদের ক্ষোভ তৈরি করে। এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই হেফাজতে ইসলামের উত্থান হয়। শাহবাগীদের প্রকৃত চরিত্র বুঝতে পেরে সাধারণ মুসলমানরাও হেফাজতের সাথে যোগ দেয়। সারা দেশব্যাপী নাস্তিক ব্লগারদের শাস্তির দাবিতে মিছিল হয়। এমন মিছিল বাংলাদেশ ইতিহাসে কখনো প্রত্যক্ষ করেনি।

চাপের মুখে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী থেকে বলা হয়, “এই মঞ্চের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত ধর্মীয় মতাদর্শ বা অবস্থান বা বক্তব্য কোনোভাবেই এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সকল আন্দোলনকারীর বা এই মঞ্চের বলে গণ্য হতে পারে না।” [৪২]

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, শাহবাগীরা রাজিবকে ডিজঔন করছে। এই বক্তব্য ৭ মার্চের। কিন্তু, ২০১৩ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হওয়া এই বইটিতে রাজিবকে নিয়ে কবিতা আছে ৫ টি, আছে একটি গানও। সবগুলোতেই রাজিবকে সম্বোধন করা হয়েছে ‘শহীদ’ হিসেবে। তবে কি রাজিবকে ডিজঔন করা কেবলমাত্র একটা পাব্লিসিটি স্টান্ট ছিলো না?

শাহবাগ ইসলামবিদ্বেষী থাবা বাবাকে ঔন করে। তাকে নিয়ে কবিতা লেখে, গান লেখে। তার আদর্শ জাগরুক রাখতে চায়। তাকে বানায় ‘চেতনার ধ্রুবতারা’ [৪৩] এবং বলা হয়,

“রাজিব তুমি চলো

আমরাও ছুরিতে চুমু খেতে খেতে

তোমার দেখানো পথে চলতে থাকবো।” [৪৩]

রাজিবের দেখানো পথ কোনটি? ইসলামবিদ্বেষের পথ? ইসলামকে নিয়ে কটূক্তির পথ?

দুয়ে দুয়ে চার মেলালে আমরা দেখতে পাই, “মৌলবাদ” বিরোধিতা, জামায়াত-শিবির-হেফাজতকে না-মানুষকরণ, থাবা বাবাকে গ্লোরিফাই করা – এইসব মূলত একসূত্রে গাঁথা। আর তা হলো – শাহবাগীদের সুপ্ত ইসলামবিদ্বেষ। এজন্য, বিরোধিতা সত্ত্বেও বিএনপিকে ফিরে আসতে বলা – কিন্তু জামাত-হেফাজতের কোনো ক্ষমা না, কোনো দ্বিতীয় সুযোগ নাই। এজন্যই আবরার ফাহাদকে “নামাজ পড়তে ডাকার” অজুহাতে শিবির “সন্দেহ” করা। এজন্যই নাটক-সিনেমায় রাজাকারের দাঁড়ি-টুপি। এজন্যই যুদ্ধাপরাধীকে কেবল যুদ্ধাপরাধী বলা হয় না। সাথে ‘মৌলবাদি”, “ধর্মান্ধ” [৪৪], “ধর্মীয় গোঁড়ামিযুক্ত” [৪৬], “প্রগতি বিরোধী” [৪৫], “জঙ্গি” [৪৭] যুক্ত করা হয়। জামায়াত-শিবির এবং বাকি যাদেরকে এই লিস্টে যুক্ত করা হয়েছে (মূলত হেফাজত ও অন্যান্য ইসলামী দল), তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কেবলই যুদ্ধাপরাধের নয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ মৌলবাদের, ধর্মান্ধতার, ধর্মীয় গোঁড়ামির, প্রগতি বিরোধিতার, নারীকে ঘরবন্দি করার, জঙ্গি হওয়ার, বাংলাদেশকে মুসলিম বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া [৫২], বাঙালির হাজার বছরের সাংস্কৃতি আন্দোলনকে মূল্য না দেয়া [৫৩] ইত্যাদি। তাই, শাহবাগ আন্দোলনকে কেবলই যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবির আন্দোলন বলা যাবে না। এর দাবি-দাওয়া, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আরো ব্যাপক এবং বিস্তৃত যা আমরা কিছুটা হলেও অনুধাবন করতে পেরেছি। আরো ব্যাপক গবেষণা আরো অনেক গভীরের বিষয়াদিও তুলে আনতে সক্ষম বলে আমার বিশ্বাস।

শাহবাগ, ভায়োলেন্স এন্ড দ্য বাইনারি বইটিতে বারবার শাহবাগকে একটি অহিংস ও শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘অহিংসা’র নমুনা তো আপনারা ইতোমধ্যেই দেখেছেন। আরো কিছু উদাহরণ দেখি যেখানে আপনারা ভায়োলেন্সের আহবান দেখতে পাবেন। কামাল লোহানীর কবিতায় তিনি জামায়াত-শিবিরকে উদ্দেশ্য নিয়ে লিখেছেন,

“ওরা মানুষ মারছে

আসুন আমরা পশু হত্যা করি।” [৪৮]

আরেকটি কবিতায় এসেছে, “সে ভুলবে না কখনো বারুদের আ – কার ই – কার” [৪৯]। “আদিম হিংস্র মানবিকতার আমি যদি কেউ হই প্রবন্ধে সরাসরি “লোন উলফ” এটাকের আহবান জানানো হয়েছে [৫০] এবং

কিছুটা হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে, “একটা যৌক্তিক সময়ের মধ্যে দাবির সুরাহা না হলে পরিস্থিতি Violence এর দিকে যেতে পারে।” [৫১]

আচ্ছা, শাহবাগ ফ্যাসিবাদি, শাহবাগ ভায়োলেন্ট যাই হোক না কেন, সে তো তার শত্রুদের জন্য। আপনি ভাবতে পারেন, আমি তো ভাই রাজনৈতিক মানুষ না, আমি নিরাপদ। কথা হলো, শাহবাগ কি আপনাকে চয়েস দেয়? এই প্রশ্নের উত্তরও হচ্ছে, না। বিশ্বব্যাপী “সন্ত্রাসবিরোধী” যুদ্ধের সময় জর্জ ডব্লিউ বুশ বলেছিলেন, “হয় আপনারা আমাদের সাথে আছেন, নাহলে সন্ত্রাসীদের সাথে।” অর্থাৎ, বাইনারি অপশন। তৃতীয় কোনো অপশন নাই, মতামত নাই, পর্যালোচনা নাই। আমেরিকার সাথে না থাকলে আপনি অবশ্যই সন্ত্রাসীদের সাথে আছেন এবং আপনাকেও সন্ত্রাসী কিংবা সন্ত্রাসীদের দোসর হিসেবে চিহ্নিত করা হবে ও দমন করা হবে। শাহবাগও তাই করে। “ঠিকানা শাহবাগ” নামে গল্পটিতে আউয়াল সাহেব শাহবাগের আন্দোলনকে পছন্দ করেন না। এর যে কত কারণ থাকতে পারে তা আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি। কিন্তু এই পছন্দ না করার কারণে গল্পে যা এসেছে তা হলো – “তিনি কেন শাহবাগকে সহ্য করতে পারেন না! তাহলে কি তিনি রাজাকার! নাকি তাদের সহযোগী!”

অর্থাৎ, শাহবাগকে পছন্দ না করলে আপনি রাজাকার অথবা তাদের সহযোগী। আপনার হাতে আর কোনো অপশন নেই। আর আপনি যদি তা-ই হন, তবে আপনার পরিণতি কী হবে তা তো আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এই একই কথাই নির্মলেন্দু গুণ তার কবিতায়ও লিখেছেন।

“তোমার সামনে খোলা আছে শুধু দুটি পথ।

…

…

অন্যপথের শেষে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে

দান্তের নরখ, জাহান্নামের হাবিয়া দোজখ।”

“শুধু” শব্দটি খেয়াল করুন। এটি জর্জ বুশের সেই “either/or” বাইনারিকেই নির্দেশ করে। হয় আপনি শাহবাগে যাবেন, নয়ত আপনি যুদ্ধাপরাধী, রাজাকার, রাজাকারের দোসর। আপনার নাগরিকত্ব বাতিল হবে, গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়া হবে, চাকরি দেয়া হবে না, জেলে ঢোকানো হবে, আপনার প্রতিষ্ঠান কেড়ে নেয়া হবে, আপনাকে ‘সন্দেহ’ করে মেরে ফেলা হবে। শাহবাগীদের দেশে আপনি ‘না-মানুষ’।

তথ্যসূত্র

১। জীবনের শাহবাগ, জীবনযুদ্ধের শাহবাগ। পৃষ্ঠা, ৭।

২। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা, ২৪২।

৩। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা, ২৪২।

৪। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা, ৩২০।

৫। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩২১-২২।

৬। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩২৫

৭। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩২১, ৩২৫, ৩৫৪

৮। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩২৩

৯। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩৪৩

১০। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ১৭

১১। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৪৭

১২। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ২২৫

১৩। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ২২৭

১৪। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ২২৭

১৫। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ২৫৫

১৬। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩০৩

১৭। টাইটেল: Bangladesh split as violence escalates over war crimes protests, The Guardian। প্রকাশকাল: ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩। লাস্ট একসেসড: ২১ আগস্ট, ২০২৩।

লিংক: https://www.theguardian.com/world/2013/feb/23/protest-death-penalty-bangladesh

১৮। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩২১

১৯। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩২৫

২০। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩৫৪

২১। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩৬১

২২। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩৮৩

২৩। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ২৫৪

২৪। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩৭৯

২৫। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩৮২

২৬। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩০

২৭। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩১

২৮। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ২৮৫

২৯। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩১৯

৩০। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩২৫

৩১। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩৭৬

৩২। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ২২৯

৩৩। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩২৫

৩৪। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ১০৪

৩৫। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ২৭০

৩৬। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩৪৩

৩৭। টাইটেল: ফিরে দেখা: ২০১৩ সালের রাজনীতি, বিবিসি। প্রকাশকাল: ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৩। লাস্ট একসেসড: ২১ আগস্ট, ২০২৩

লিংক: https://shorturl.at/gnAB7

৩৮। টাইটেল: দু’দিনে নিহত ১৭ জন, ২ এপ্রিল ফের বিক্ষোভ, দৈনিক নয়াদিগন্ত। প্রকাশকাল: ২৮ মার্চ, ২০২১। লাস্ট একসেসড: ২১ আগস্ট, ২০২৩।

লিংক: https://shorturl.at/aEGTU

৩৯। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩৪৬

৪০। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩৪৭

৪১। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ২৮২

৪২। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩৩৬

৪৩। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৭৩

৪৪। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩৫৮

৪৫। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩৫০

৪৬। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩৪১

৪৭। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩৩৮

৪৮। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩৬

৪৯। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৪২

৫০। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ২৭৯

৫১। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩৫৭

৫২। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩৪১

৫৩। জীশাজীশা, পৃষ্ঠা ৩০৬